ম ঞ্চ স ং বা দ

আগস্ট ১৯৯৩ ☐ নাগরিক মঞ্চের সদস্য, সহযোগী বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীদের জন্য

১০টি চটকলে কর্মহীন ৩৭,৮০০ শ্রমিক

পশ্চিমবঙ্গের মোট ৫৭টি চটকলের মধ্যে কয়েকটি চটকল বেশ কয়েক বছর ধরেই বন্ধ রয়েছে। ১৯৯৩ সালের এপ্রিল মাস থেকে আরও ৭টি মিল বন্ধ হয়েছে। শুধু জুন-জুলাই মাসেই বন্ধ হয়েছে ৬টি চটকল। যার শ্রমিক সংখ্যা ২১,২০০ জন। বর্তমানে চটশিল্পে ১০টি কারখানা বন্ধ থাকার জন্য কর্মহীন ৩৭,৮০০ শ্রমিক।

বন্ধ মিল	শ্রমিক সংখ্যা	বছর
১। বজবজ জুট মিল	৩৪০০	১৮ মার্চ ১৯৮৯
২। অ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট	৬০০০	২১ মে ১৯৯১
৩। বালি জুট	৪০০০	২৬ আগস্ট ১৯৯২
৪। ক্যালিডোনিয়ান জুট	৩২০০	১৪ এপ্রিল ১৯৯৩
৫। ওয়েভারলি জুট	৫০০০	৬ জুন ১৯৯৩
৬। প্রবর্তক জুট মিল	১৯০০	১৫ জুন ১৯৯৩
৭। ই. এম. কোম্পানী	১৯০০	১৭ জুন ১৯৯৩
৮। ইণ্ডিয়া জুট মিল	৪৪০০	১৯ জুন ১৯৯৩
৯। মেঘনা জুট	৪০০০	জুন, ১৯৯৩
১০। হুগলী জুট মিল	৪০০০	জুলাই, ১৯৯৩
	৩৭,৮০০	

যেগুলি খোলা আছে, সেখানে বেশিরভাগ শ্রমিকের মধ্যেই বন্ধের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। কারণ মিলগুলির উৎপাদন কমছে, কাঁচামালের যোগান নেই, বদলি শ্রমিক ও জিরোনাম্বার বলে পরিচিত দিনমজুরির শ্রমিকরা কাজ পাচ্ছেন না। যেহেতু পাটের যোগান নেই, ফলে উৎপাদন খরচ বাড়ছে। এই অজুহাতে চটশিল্পের মালিকরা মিলগুলি বন্ধ করে শ্রমিক ছাঁটাই, কম মজুরি কাজের চাপ বাড়ানোর প্রস্তাব দিচ্ছেন। গত জুন মাসে বন্ধ হয়েছিল ভিক্টোরিয়া জুট মিল, ১৫ জুলাই এক দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে কারখানা খুললেও ৫৩০জন শ্রমিককে অবসরগ্রহণে বাধ্য করা হয়েছে ও কাজের চাপ অনেক বেশি বাড়ানো হয়েছে।

প্রতি বছর জুন জুলাই মাস থেকে পাট ওঠার মরশুমের শুরুতে মিল বন্ধ রেখে পাট চাষীদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে, অভাবী বিক্রয় বা সাপোর্ট মূল্যের থেকে কম দামে চাষীরা মিলগুলির দালালদের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হন। এর ফলে ক্রমশ পশ্চিমবঙ্গে পাট চাষের প্রতি চাষী উৎসাহ হারিয়ে ফেলছেন। গত বছর ৯২-৯৩তে পাটকলগুলির প্রয়োজন ছিল ৭৫ লক্ষ কুইন্টাল (বেল)। পাট উৎপাদন হয়েছে ৭০ লক্ষ কুইন্টাল (বেল)। পাট ওঠার দু তিনমাস আগে পর্যন্ত জে সি আই ও অন্যদের কাছে একটা স্টক থাকত। তাই দিয়ে চাহিদা ও যোগানের এই ফারাকটা পূরণ হত। কিন্তু এ বছরে জে সি আইর ভাণ্ডার শূন্য। ফলে যতটুকু পাট বাজারে আছে তা নিয়ে চলছে ফাটকা। আগামী ৯৩-৯৪ সালে কাঁচা পাটের উৎপাদন সম্পর্কে যে চিত্রের আভাস পাওয়া যাচ্ছে তাতে বলা হচ্ছে, এ বছরের উৎপাদন মিলগুলির চাহিদার তুলনায় ৩০% কম। ৯৩-৯৪ সালে কাঁচা পাটের অপ্রতুল যোগানের দরুন উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যাওয়ার ফলে ২৫% কারখানা বন্ধ থাকবে।

কয়েক বছরের হিসেব লক্ষ্য করলে দেখা যাচ্ছে মোট বাৎসরিক উৎপাদিত পাটের ১০% কেনে জুট কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া। গত বছর থেকেই জে সি আই-র বাজেটে পাট কেনার মতো টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছে না, এর ফলে কাঁচা পাটের উৎপাদক সরকারি-ঘোষিত মূল্য পাচ্ছে না এবং পাটের দাম নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে দালাল-এজেন্ট ফড়েদের ইচ্ছামত।

এই বছরে পাট ওঠার আগে বা পরেও সঙ্কট বাড়বে।

কারণ
- ■ জে সি আই-র কাছে কোনও পাট নেই।
- ■ আসামে ও উত্তরবঙ্গে বন্যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পাট উৎপাদন।
- ■ এবার পাট উৎপাদন হবে গত বছরের তুলনায় ১০ থেকে ১৫ শতাংশ কম জমিতে।
- ■ জে সি আই-র কাছে মজুত পাটও নেই এবং পাট কেনার টাকাও নেই।

এ বছরে কেন্দ্রীয় সরকার পাটের সরকারি মূল্য (Support Price) বাড়াতে পারে অর্থাৎ ৪৮৫ থেকে ৫৩০ টাকা কুইন্টাল হতে পারে। গত বারের তুলনায় ৫০ টাকা বাড়বে বলে বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেছে।

রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার, ট্রেড ইউনিয়নগুলি চটশিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বেশির ভাগ ব্যক্তি বা সংগঠন চটশিল্পের সঙ্কট নিয়ে নানান বিষয়ে আলোচনা করলেও পাটচাষ ও চাষীদের উপযুক্ত দাম পাওয়ার বিষয়ে কার্যকরি কিছুই করেন নি। চটশিল্পকে বাঁচাতে গেলে পাট চাষের উন্নয়ন উৎপাদন নিয়ে কিছু করাটা জরুরি, এ ব্যাপারে বিবৃতি ছাড়া সরকারি প্রচেষ্টার যেমন কোনো উদাহরণ নেই, তেমনি নিরব দর্শক শ্রমিক সংগঠনগুলি। ফলে ৪০ লক্ষ পাট চাষী ও ২ লক্ষ চটশিল্পের শ্রমিক আজ সংকটে।

কাঁচা পাটের চাহিদা ও যোগান

	১৯৯২-৯৩ (লক্ষ বেল)	১৯৯৩-৯৪
বছরের শুরুতে মজুত	২৮.৫০	১৮.২৭
উৎপাদন	৭০.০০	৬৩.০০
আমদানি	০.৫০	২.০০
মোট যোগান	৯৯.০০	৮৩.২৭
মিলগুলির প্রয়োজন	৭৫.০০	৭৩.০০
অন্যান্য প্রয়োজন	৫.০০	৫.০০
রপ্তানী	০.৭৩	০.৫০
মোট বণ্টন	৮০.৭৩	৭৮.৫০
মজুত	১৮.২৭	৫.০০

এন টি সি-র সঙ্কট ও সম্ভাবনা

৮ জুলাই, ৯৩, বি আই এফ আর-এ পূর্বাঞ্চলের এন টি সি (ন্যাশনাল টেক্সটাইল কর্পোঃ) মিলগুলির রুগ্নতা নিয়ে প্রথম শুনানি হয়। পূর্বাঞ্চলের ১৮টি মিলের শ্রমিক কর্মচারীদের ১৮টি ইউনিয়ন ও ফেডারেশন এই শুনানিতে হাজির ছিল। আলোচনার প্রথমদিন আই ডি বি আইকে অপারেটিং এজেন্সি নিয়োগ করে দু মাসের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়। এন টি সি ভুক্ত টেক্সটাইল মিলগুলির ভবিষ্যৎ নির্ধারনের ক্ষেত্রে বি আই এফ আর ত্রিপাক্ষিক আলোচনা, পুনর্গঠন, আধুনিকীকরণ, স্পিণ্ডলের সংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়গুলোর দিকে বিশেষ নজর দেবার জন্য আই ডি বি আইকে মৌখিক নির্দেশ দেয়।

আলোচনায় উপস্থিত ১৮টি ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের মধ্যে ৪টি সংগঠনের পক্ষ থেকে লিখিতভাবে এন টি সি সংক্রান্ত বক্তব্য পেশ করা হয়। পূর্বাঞ্চলীয় এন টি সি মিলগুলির তথাকথিত প্রতিষ্ঠিত শ্রমিক নেতৃত্বের মিলগুলির পুনরুজ্জীবন প্রসঙ্গে ন্যূনতম গঠনমূলক চিন্তাভাবনার দৈন্যতা এই আলোচনায় প্রকটভাবে দেখা দেয়। বরং অযাচিতভাবে উপস্থিত হওয়া ছোট্ট একটি শ্রমিক সংগঠন, সোদপুর কটন মিলস ওয়ার্কমেন্স ইউনিয়ন এবং আমন্ত্রিতদের মধ্যে অন্যতম এন টি সি-র স্টাফ ও সাবস্টাফ এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন, নাগরিক মঞ্চের সহযোগিতায় এন টি সি পুনরুজ্জীবনের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য স্মারকলিপি আকারে পেশ করে। ভবিষ্যতে বিস্তৃতভাবে পুনরুজ্জীবন প্রস্তাব পেশ করার কথাও তাঁরা জানান। ওই দুটি সংস্থার স্মারকলিপিতে দাবি করা হয়ঃ

■ এন টি সি পুনরুজ্জীবনের স্বার্থে অবিলম্বে প্রতিটি ইউনিটে জয়েন্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটি তৈরি করা হোক। এবং সেই কমিটির শ্রমিক প্রতিনিধিদের অবশ্যই সাধারণ শ্রমিকদের দ্বারা নির্বাচিত হতে হবে। ■ সমস্ত ইউনিটের ম্যানেজমেন্ট কমিটির মধ্যে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা প্রয়োজন, যাতে অন্য কারও উপর নির্ভরশীলতা না থাকে এবং আমলাতান্ত্রিক লাল ফিতের ফাঁসে পড়তে না হয়। ■ কলকাতায় এন টি সি-র একটা মাত্র অফিস রেখে বাকি সবগুলো তুলে দেওয়া হোক এবং অফিসগুলির উদ্বৃত্ত কর্মীদের আরও বেশি বেশি করে কাজে লাগানোর জন্য মিলগুলিতে নিয়োগ করা হোক। ■ ১৯৯০ সালে গঠিত সরকারি 'টু ম্যানস' কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী আর্থিক পুনর্গঠন, আধুনিকীকরণ ও স্পিণ্ডলের সংখ্যাবৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হোক। এন টি সি-র পুনরুজ্জীবন প্রসঙ্গে 'টু ম্যানস'

কমিটির অনেকগুলি সুপারিশের মধ্যে অন্যতম ছিল, 'স্পিনিং মিলগুলির স্পিণ্ডলের সংখ্যা ন্যূনতম ২৫০০০ হওয়া উচিত'। অথচ সেই সুপারিশ অনুযায়ী কোনও উদ্যোগই নেওয়া হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সোদপুর কটন মিলে স্পিণ্ডলের সংখ্যা বর্তমানে মাত্র ১১৫০৮।

বি আই এফ আর-এ শুনানির পর এলাহাবাদ টেক্সটাইল ইণ্ডাস্ট্রিজ রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন (এ টি আই আর এ) সোদপুর মিল পরিদর্শন করে। মৌখিকভাবে শ্রমিক-কর্মচারীদের কাছে মন্তব্য করেন যে ইউনিটটিতে প্রয়োজনের তুলনায় শ্রমিক সংখ্যা কম। অথচ মাত্র কিছুদিন আগে বর্তমান কর্তৃপক্ষ ৪৪জনকে স্বেচ্ছা-অবসর নিতে বাধ্য করে। সোদপুর কটন মিল ওয়ার্কমেন্স ইউনিয়নের নেতৃত্বের মতে ২৫,০০০ স্পিণ্ডল চালালে ও প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গীক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে মিলটি শুধুমাত্র লাভজনকই হয়ে উঠবে না, উপরন্তু অনতিবিলম্বে বেশ কিছু বেকারের চাকরি হবে।

নারী-পুরুষ বৈষম্য সিইএসসি-তে

মহিলা ও পুরুষদের জন্য দুরকমের নিয়ম দিব্যি চালু রয়েছে সিইএসসি-তে। সিইএসসি-র কোনও কর্মীর কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু হলে তাঁর পরিবারের কোনও একজনের চাকরি হওয়ার রীতি আছে ওই সংস্থায়। কিন্তু সেই রীতিও নারী এবং পুরুষের ক্ষেত্রে দুরকমের।

কোনও কর্মীর মৃত্যুর পর চাকরির দাবিদার যদি হন মহিলা, তাহলে তাঁকে অবশ্যই মাধ্যমিক পাশ হতে হবে। কিন্তু তিনি পুরুষ হলে সে ঝঞ্ঝাট নেই। এবং সিইএসসি-র বহু মৃত কর্মীর পুরুষ আত্মীয়ই কোনরকম 'পাশ' ছাড়াই চাকরি করছেন। যত বিপত্তি মহিলাদের বেলায়। আমাদের দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার কারণে অনেক কর্মীর স্ত্রী-ই মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশুনা করতে পারেন না। ফলে অদ্ভুত ওই নিয়মের শিকার হতে হচ্ছে তুলনামূলকভাবে দরিদ্র পরিবারগুলোকে। অথচ মৃতকর্মীর মহিলা আত্মীয়াকে চতুর্থ শ্রেণীর কোনও পদে নিয়োগ করা যায় অনায়াসেই — তার জন্য মাধ্যমিকের ফতোয়া একেবারেই অবান্তর। এ ব্যাপারে সিইএসসি-র ইউনিয়নগুলোও উদাসীন। তাঁদের কাছে বারবার বলেও ফল হয়নি। ইউনিয়নগুলি যথারীতি নিরুত্তর। শেষ পর্যন্ত কল্পনা দেবনাথ নামে চাকরির এক দাবিদার দ্বারস্থ হয়েছেন মহিলা কমিশনের। সম্প্রতি তিনি পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের কাছে তাঁর অভিযোগ দায়ের করেছেন।

অন্ধ্র স্টিলের হাল অবস্থা

অন্ধ্র স্টিল করপোরেশন লিমিটেড হাইকোর্টে নিলামে ওঠে ১৯৮০ সালের ১৮ মার্চ। সজন কুমার আগরওয়ালা ৩ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা দিয়ে ওই কোম্পানি কিনে নেয়। নাম বদলে হয় গ্রাণ্ড স্টিল এ্যাণ্ড অ্যালয়েজ লিমিটেড। পাওনাদারদের নানান মামলা নিষ্পত্তি হতে সময় লাগে তিন বছর। তারপরেও নানা বিরোধ মিটিয়ে ফ্যাক্টরি চালু হয় ১৯৮৫ সালের মার্চ মাসে। সেই সময় কারখানা চালানোর মতন পুঁজি না থাকায় মালিকরা ঋণ নিয়ে উৎপাদন চালু করেন। পাশাপাশি সেই সময়ই বাজারে স্ক্র্যাপ ও স্টিলের দাম অনেকটা বেড়ে যায়। সব- মিলে, উৎপাদন শুরু হলেও হিসেব অনুযায়ী মালিকদের লোকসান হতে থাকে। শ্রমিকদের বেতনও অনিয়মিত হয়ে পড়ে। কিছুদিনের মধ্যে উৎপাদন কমতে শুরু করে, পাওনাদারদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। কর ফাঁকি দেওয়া শুরু হয়। শ্রমিকদের ই এস আই, পি এফ বাকি পড়ে যায়।

শেষ পর্যন্ত ৯২ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে শ্রমিকদের মাইনে নিয়ে গণ্ডগোলকে সামনে রেখে কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। ২৩ ফেব্রুয়ারি '৯২ সাসপেনসন অব ওয়ার্ক ঘোষিত হয়। সেই সময় শ্রমিকসংখ্যা ছিলো ২৫৭। গত মে '৯৩ এই বন্ধ কারখানার তিনটি ইউনিয়ন যথাক্রমে সিটু, ইনটাক ও টি ইউ সি সি যৌথভাবে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা শুরু করে। ইউনিয়নগুলোর একটি সাধারণ সভায় 'গ্রাণ্ড স্টিল অ্যালয়েজ বাঁচাও কমিটি' তৈরি হয়। সভায় হাজির ছিলেন শ্রমিকদের প্রায় সবাই। সবকটা ইউনিয়নের নেতৃত্বে সভ্যদের নিয়ে কাজ করতে শুরু করে কমিটি। তাঁদের সাহায্য করার জন্য সাত জনের একটা উপদেষ্টা মণ্ডলী গঠিত হয়। নাগরিক মঞ্চের দুজন কর্মীও আছেন সেখানে। গ্রাণ্ড স্টিল অ্যাণ্ড অ্যালয়েজ লিমিটেড লিকুইডেশনে গেছে। হাইকোর্টের এক নোটিশের বলে ৪ আগস্ট এই কারখানার নিলামে ওঠার কথা। বাঁচাও কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, শ্রমিকরা কো-অপারেটিভ করে চালানোর জন্য এই নিলামে কারখানা কেনার দাবি রাখবেন হাইকোর্টের কাছে।

সেই সিদ্ধান্ত মোতাবেক একটি বিকল্প পুনরুজ্জীবন স্কিম তৈরি করা হয়েছে। কারখানার শ্রমিকরা, নাগরিক মঞ্চ ও মঞ্চ-এর কয়েকজন সহযোগী বন্ধু মিলে এই স্কীম তৈরি করেছেন। সেটা নিলামের সময় আদালতে নিয়ম অনুযায়ী জমা দেওয়া হবে।

মিথ্যা খবর !

বন্ধ টিটাগড় পেপার মিল কি খুলেছে ?

১৯৯১ সালের ১৫ আগস্ট 'গণশক্তি'-তে লেখা হয় 'দীর্ঘ ৬ বছর পর আগামী ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসে টিটাগড় পেপার মিল পুনরায় চালু হচ্ছে।' খবরটির শিরোনাম ছিল : 'টিটাগড় পেপার মিল খুলছে আজ।' আমরা খবর নিয়ে জেনেছি, টিটাগড় পেপার মিলের মরচে ধরা তালা এখনও ঝুলছে।

অথচ ১৯৯২ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি গণশক্তিতেই ফের খবর বেরোয় : প্রায় পাঁচ বছর বন্ধ থাকার পর রাজ্য সরকারের উদ্যোগে টিটাগড় পেপার মিল গত ১৫ আগস্ট চালু হয়।'

মিল গেটের তালার মরচের বয়স ৫ বছর না ৬ বছর, গণশক্তির খবর মোতাবেক, তা নিয়ে একটা সংশয় দেখা দিতে পারে। তবে মিল যে আজও খোলেনি সে বিষয়ে আমরা নিঃসংশয়। অবশ্য সামনেই আরও একটা স্বাধীনতা দিবস।

ডঃ ওঙ্কার গোস্বামীর রিপোর্ট : বি আই এফ আর

'বি আই এফ আর ও শিল্পের রুগ্নতা' নিয়ে সরকার একটি কমিটি তৈরি করেন ওঙ্কার গোস্বামীর নেতৃত্বে। এই কমিটি গত জুলাই মাসে রিপোর্টটি পেশ করেন। কমিটির কয়েকটি সুপারিশ নিয়ে বিতর্ক উঠেছে। নাগরিক মঞ্চ প্রাথমিকভাবে যতটুকু জেনেছে তার ওপর সুস্পষ্ট কোনো মতামত দেওয়া সম্ভব নয় বলে চেষ্টা চলছে পুরো রিপোর্টটি নিয়ে বি আই এফ আর সংক্রান্ত একটি পুস্তিকা প্রকাশ করার। রিপোর্টের বি আই এফ আর-এ বিচারাধীন মামলাগুলির দীর্ঘসূত্রিতা নিয়ে কমিটির পরিসংখ্যান ও সমালোচনা কিছুটা উল্লেখ করা হল :

■ বি আই এফ আর-এ ৫৬৩টি কেসের নিষ্পত্তিতে সময় লেগেছে প্রায় ৭৪৯ দিন, দু বছরের বেশী।

■ ৯০% কেসে সিদ্ধান্ত পৌঁছতে তিন বছরের বেশি সময় লেগেছে।

■ বি আই এফ আর-এ নথীভুক্ত শিল্পের মধ্যে ১৫% কেসে ৫ বছরের বেশি সময় লেগেছে।

■ [illegible]% কেসে ৪ বছরের বেশী সময় লেগেছে নিষ্পত্তিতে।

কেসগুলির সিদ্ধান্ত নিতে বি আই এফ আর-এর দেরি লাগার কারণ হিসাবে ওঙ্কার গোস্বামী কমিটি মনে করেন, কারখানা তুলে না দিয়ে বি আই এফ আর শিল্পটি পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা চালিয়েছে। শ্রমিকরা যাতে কাজ না হারান সেদিকে লক্ষ্য রাখতেই এই দীর্ঘসূত্রিতা, কিন্তু গোস্বামী কমিটি মনে করেন, এতে পুনরুজ্জীবন হয়নি বরং বন্ধ কারখানার সংখ্যাই বেড়েছে। ফলে শ্রমিকরা আরও বেশি বেশি করে দরিদ্র হয়ে পড়ছেন।

ই এস আই কর্পোরেশনের আয় ব্যয়

বছর	আয় কোটি টাকায়	ব্যয়	মুনাফা
'৮৭-'৮৮	৩৯৩.৩৫	২২৭.৫৪	১১৭.৮১
'৮৮-'৮৯	৪২১.২৭	২৯৭.২১	১২৪.০৬
'৮৯-'৯০	৪৩৭.৮৫	৩১৪.৫১	১২৩.৩৪
'৯০-'৯১	৪৪২.১৬	৩২৫.৭৩	১১৬.৪৩
'৯১-'৯২	৪৫০.৮৪	৩৮৫.১০	৬৫.৭৪

উৎস : বার্ষিক রিপোর্ট ১৯৯১-৯২, এমপ্লয়িজ স্টেট ইনস্যুরেন্স কর্পোরেশন, নয়া দিল্লি। আয়ের মধ্যে ধরা হয়েছে : শ্রমিক/কর্মচারী/মালিকদের কাছ থেকে নেওয়া চাঁদা এবং অন্যান্য আয়। আয় ব্যয়ের মধ্যে ধরা হয়েছে : চিকিৎসা পরিষেবা, আর্থিক ও অন্যান্য সুবিধা, প্রশাসনিক ব্যয় এবং অন্যান্য ব্যয়।

[illegible] সরকার একশ কোটি টাকার বেশি মুনাফা করছে। তারপরেও শ্রমিকরা চিকিৎসার সুযোগ, ছুটির পয়সা, শারীরিক ক্ষয়ক্ষতির জন্য প্রাপ্য ন্যায্য সহায়তা থেকে বঞ্চিত।

আয়ের তুলনায় ব্যয় কম হচ্ছে এটা যেমন ই এস আই সির মুনাফা বাড়াতে সাহায্য করছে, অন্যদিকে ব্যয়ের মধ্যে আবার 'আর্থিক ও অন্যান্য সুবিধা' বাবদ খরচ কম করা হয়েছে। ১৯৮৭-৮৮ সালে যেমন এই খাতে ব্যয় ছিল ১০৪.৫২ কোটি টাকা, ১৯৯০-৯১ সালে একই খাতে ব্যয় করা হয়েছে ৭৩.৪২ কোটি টাকা। শ্রমিক কর্মচারীদের প্রাপ্য না পাওয়ার আসল রহস্যটা এখানেই লুকিয়ে আছে।

৯১-৯২ সালে আয় আগের বছরের তুলনায় সামান্য বাড়লেও আয় ব্যয়ের ফারাকটা অনেকটা কমেছে। কারণ ১৬০০ টাকা আয় ই এস আই অন্তর্ভুক্তির সীমা হয়ে যাওয়ায় কয়েক লক্ষ শ্রমিক ই এস আই-এর আওতার বাইরে চলে যান। আবার ১৯৯২-এর এপ্রিলে মাসিক ৩০০০ টাকা আয় ঊর্ধ্বসীমা হওয়ায় কয়েক লক্ষ শ্রমিক কর্মচারীদের ই এস আই-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ছেন। ফলে ১৯৯২-৯৩ সালে ই এস আই-এর রোজগার বাড়বে। বাড়বে মুনাফাও।

প্রকাশক : নাগরিক মঞ্চ, ১৩৪ রাজা রাজেন্দ্র মিত্র রোড, কলকাতা ৭০০০৮৫-র পক্ষে বিভাস বন্দ্যোপাধ্যায়।